বাংলাদেশ ২০১৯ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন

সারসংক্ষেপ

সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছে তবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন করে। এটি ধর্মীয় বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে এবং সকল ধর্মের জন্য সমতা নিশ্চিত করে। ২৭ নভেম্বর, একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে ২০১৬ সালের ২২ জন প্রধানত অমুসলিম ব্যক্তির হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত আট আসামির মধ্যে সাতজনকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করে, এবং অষ্টম অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। বিবাদীপক্ষের আইনজীবীগণ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা সমস্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। জঙ্গিবাদ রোধ ও মসজিদগুলো "উস্কানিমূলক" বার্তা দেয় কিনা তার নজরদারির প্রয়াসে সরকার সারাদেশে ইমামদের ধর্মোপদেশগুলির বিষয়বস্তুতে নির্দেশনা প্রদান করে চলেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সদস্য যারা কখনও কখনও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সদস্যও, তাদের মতে তাদের নিজস্ব বসবাসরত এলাকাসমূহে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘটিয়ে তাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও জমি দখল রোধে সরকার অকার্যকর ছিল। সরকার ধর্মীয় স্থান, উৎসব এবং যেসব আয়োজন সহিংসতার সম্ভাব্য লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিতহয় সেগুলোতে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনিদের নিযুক্তি অব্যাহত রাখে ।

অক্টোবরে আন্দোলনকারীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ২০ অক্টোবর ভোলায় দু'জন মুসলমানকে গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়ায় একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা করে, যাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির উদ্দেশ্যে একজন হিন্দু শিক্ষার্থীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সংঘর্ষে শতাধিকেরও বেশি আহত হয় এবং পুলিশ আত্মরক্ষার কথা বলে চার ব্যক্তিকে হত্যা করে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগস্টে পুলিশ ঢাকা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) দূরে কুমিল্লার একটি রেল ব্রিজের নিচে থেকে জ্ঞানরত্ন বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু অমৃত নন্দার লাশ উদ্ধার করে । সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, নন্দার গলা চেরা ছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যরা জানিয়েছেন, নন্দা ঢাকা থেকে নিজ শহরে ফিরছিলেন। খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের হয়রানি, সাম্প্রদায়িক হুমকি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (বিএইচবিসিইউসি)বলেছে যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে "নৃশংসতা" অব্যাহত ছিল যদিও তা কমেছে ।

সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে ও প্রকাশ্য বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূত ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ ধর্মের নামে সহিং আচরণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার ও সহনশীলতার পরিবেশ বজায় রাখতে ও সরকারকে উৎসাহিত করেন। দূতাবাস সরকারকে সফলভাবে অনুরোধ করে যেন একজন হিন্দু কর্মীকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা না হয়। রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের সদস্য, এনজিও এবং ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে ধর্মীয় সহনশীলতার উপর গুরুত্বারোপ অব্যাহত রেখেছেন এবং ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিংস উগ্রবাদের মধ্যে যোগসূত্র অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছেন । ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র

বার্মা থেকে পালিয়ে আসা অসংখ্য জাতিগত মুসলিম রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে **৬৬৯** মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে।

অধ্যায় ১: ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬১.১ মিলিয়ন (মধ্য ২০১৯ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী) । ২০১৩ সালের আদমশুমারি অনুসারে, সুন্নি মুসলমান জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ এবং হিন্দু জনসংখ্যা ১০ শতাংশ। জনসংখ্যার বাকি অংশটি মূলত খ্রিস্টান (বেশিরভাগ রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরবাদ-হিনায়না বৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলিম, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমাদিয়া মুসলিম, অজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী রয়েছেন।এসব ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাগণ তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুসারীর সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে এক এক লাখের মধ্যে বলে অনুমান করে থাকেন ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) এবং উত্তরের জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত জাতিগত সংখ্যালঘুরা সাধারণত ইসলাম ভিন্ন অন্য বিশ্বাস অনুশীলন করেন । ময়মনসিংহের গারোরা মূলত খ্রিস্টান, যেমনটা গাইবান্ধার কিছু সাঁওতাল। বেশিরভাগ বৌদ্ধ ধর্মানুসারীগণ সিএইচটি-র আদিবাসী (অবাঙালি) জনসংখ্যার সদস্য। বাঙালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরা কমিউনিটি হিসেবে বরিশাল জেলার বরিশাল সিটি ও গৌরনদী, গোপালগঞ্জ জেলার বানিয়ারচর , ঢাকা শহরের মনিপুরীপাড়া ও খ্রিস্টানপাড়া এবং গাজীপুর ও খুলনা শহরে বসবাস করেন ।

দেশের বৃহত্তম অনাগরিক জনসংখ্যা রোহিঙ্গা, যারা প্রায় সবাই মুসলিম। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর হিসেব অনুযায়ী, নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী দফায় দফায় বার্মা থেকে পালিয়েছেন । সর্বসাম্প্রতিক, ২০১৭ সালের আগস্টে, বার্মায় সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ৭৪০,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন । ২০১৭ সালের সেই জনপ্রবাহের সময় যারা এসেছেন তাদের প্রায় সবাই কক্সবাজার জেলার কুতুপালং এবং নয়াপাড়ার শরণার্থী বসতিগুলিতে এবং আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছেন । এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ রোহিঙ্গা হিন্দু।

অধ্যায় ২: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান আইনি কাঠামো

সংবিধান অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের চর্চায় রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।" সংবিধানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষে রাজনৈতিক মর্যাদাদেবে না । এতে "আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে" যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকারও দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে সংবিধানে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

দণ্ডবিধির আওতায়, ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত বা অপদস্থ করে এমন "ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলক" মনভাবপ্রসূত যে কোন বক্তব্য বা কর্ম যা অর্থদণ্ড বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো

অপরাধ হিসেবে গণ্য। যদিও দণ্ডবিধি এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়টির আর বিস্তারিত সংজ্ঞা দেয় না, আদালত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননার অভিযোগকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটি ব্যাখ্যা করেছেন। ফৌজদারি কার্যপ্রণালী বিধিতে কোন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা অন্য কোন প্রকাশনায় "জনগণের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা ধর্মীয় অনুভূতিকে হেয় করে" এমন কোন ভাষা প্রকাশ করা হলে ওই সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই আইন অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একই ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করে। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্লাসফেমি আইন নেই, কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করার জন্য দণ্ডবিধির পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের একটি অংশ ব্যবহার করে।ডিজিটাল সুরক্ষা আইন ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন তথ্যের প্রকাশনা বা সম্প্রচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এবং অপরাধকারীকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়ার সুপারিশ রয়েছে।

ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়া সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ।

কোন একক উপাসনালয়ের জন্য সরকারের সাথে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী যদি বহুসংখ্যক উপাসনালয় নিয়ে কোন সমিতি গঠনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং তারা যদি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশি সহায়তা গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে এনজিও হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে, অথবা বিদেশি সহায়তা গ্রহণ না করা হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। আইনে বলা হয়েছে এনজিওএবি সকল বিদেশী তহবিলের প্রকল্পকে অনুমোদন দেবে ও পর্যবেক্ষণ করবে। আইন লঙ্ঘনের জন্য কোন এনজিওর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা এনজিওএবি-র মহাপরিচালককে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গৃহীত বিদেশি অনুদানের তিনগুন পর্যন্ত জরিমানা আরোপ বা এনজিও বন্ধ করে দেয়ার বিধানও রয়েছে। সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন, সরকার) সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্যও এনজিওগুলোর ওপর দণ্ড আরোপ করা হতে পারে। বিদেশি কর্মী থাকলে তাকে অবশ্যই জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), পুলিশের বিশেষ শাখা, এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে, যদিও এই ছাড়পত্রের মানগুলি স্বচ্ছ নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুওলোর মতো নিবন্ধনের একই আবশ্যিক শর্ত ও প্রক্রিয়াতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে নিবন্ধন করতে হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনকালে প্রয়োজনীয় যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে যে নামে নিবন্ধন করা হচ্ছে একই নামে আর কোন সংগঠন না থাকার প্রত্যয়নপত্র; সংগঠনের বিধিবিধান/সংবিধান; দেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে সংগঠনের নেতৃত্বের ব্যাপারে নিরাপত্তা ছাড়পত্র; নির্বাহী কমিটি নিয়োগ সভার কার্যবিবরণী, নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের একটি তালিকা ও মুখ্য কর্মকর্তাদের ফটোগ্রাফ; একটি কর্ম পরিকল্পনা; সংগঠনের কার্যালয়ের চুক্তি বা লিজের একটি কপি এবং সংগঠনের সম্পত্তির একটি তালিকা; একটি বাজেট; এবং একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সুপারিশপত্র।

এনজিওএবি-তে নিবন্ধনের আবশ্যিক শর্ত একই রকম।

বিয়ে, বিয়েবিচ্ছেদ এবং দত্তক-গ্রহণ সংক্রান্ত পারিবারিক আইনে মুসলমান, হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের জন্য পৃথক বিধান রয়েছে। একই ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে এসব আইন বলবৎ করা হয়। মিশ্রবিশ্বাসী পরিবার, অপরাপর ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের জন্য আলাদা দেওয়ানি পারিবারিক আইন রয়েছে। উভয় পক্ষের ধর্ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইন দ্বারা তাদের বিয়ের আচার ও প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। একজন মুসলিম সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন তবে তাকে আবার বিয়ে করার আগে বর্তমান

স্ত্রী বা স্ত্রীদের কাছ থেকে অবশ্যই লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। একজন খ্রিস্টান শুধু একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

হিন্দু পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে। হিন্দুদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের কোন সুযোগ নেই, যদিও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। হিন্দু আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। বৌদ্ধরা হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত। বিয়েবিচ্ছেদ হয়েছে এমন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ আইনগতভাবে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন না। অন্যান্য ধর্মের বিয়ে বিচ্ছেদ হওয়া পুরুষ ও নারী এবং যেকোন ধর্মের বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে অনুমোদিত এবং দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। আইনগত স্বীকৃতির জন্য মুসলিম বিয়ে সরকারিভাবে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক, দম্পতি বা যে ধর্মগুরু বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন তিনি তা করবেন; তবে কিছু বিয়ে নিবন্ধন করা হয় না। হিন্দু ও খ্রিস্টানদের নিবন্ধন করা ঐচ্ছিক, অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ অনুসরণীয় নিজেরাই স্থির করতে পারেন।

মুসলমান পারিবারিক অধ্যাদেশের অধীনে একজন মুসলমান পুরুষ যে কোনআব্রাহামিক বিশ্বাসের নারীকে বিয়ে করতে পারেন; তবে একজন মুসলমান নারী অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারেন না। অধ্যাদেশের অধীনে একজন বিধবা যদি তিনি তার একমাত্র স্ত্রী হন তবে তার স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমআংশ পেয়ে থাকেন এবং বাকী অংশটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ হয়; প্রতিটি নারীসন্তান প্রতিটি পুরুষসন্তানের অর্ধেক অংশ পায়। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর তালাকের অধিকার কম। দেওয়ানি আদালতের অবশ্যই বিবাহবিচ্ছেদের অনুমোদন দান করতে হবে। আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ তার প্রাক্তন স্ত্রীকে তিন মাসের ভরণপোষণ প্রদান করবেন, তবে এই সুরক্ষাগুলি সাধারণত নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য: সংজ্ঞা অনুযায়ী অনিবন্ধিত বিয়ে নথিভুক্ত নয় এবং তা প্রমাণ করা কঠিন। কর্তৃপক্ষ এমনকি নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা সবসময় প্রয়োগ করে না।

ভূমির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল পারিবারিক বিরোধ ও অন্যান্য দেওয়ানি বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিমসহ সকল নাগরিকের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পথ উন্মুক্ত রয়েছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিশের ব্যবস্থা করতে আইনজীবীদের বাছাই করা এবং এর ফলাফল আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধর্মীয় অনুশীলন সম্পর্কিত বিষয়ের সমাধানে মুসলিম ধর্মীয় পন্ডিতগণ ফতোয়া জারি করতে পারেন, তবে স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা তা করতে পারবেন না। ফতোয়া যেমন শাস্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না, তেমনি তা বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে অতিক্রম করতে পারবে না।

সকল সরকারি ও সরকার-অনুমোদিত স্কুলে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পাঠ্যক্রমের অংশ। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এই বাধ্যবাধকতা নেই। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় পাঠ গ্রহণ করে থাকে, যদিও শিক্ষকগণ সবসময় শিক্ষার্থীদের মতো একই ধর্মবিশ্বাসের হন না।

কারাবিধিতে কয়েদীদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উৎসবের দিনগুলোতে কয়েদীদের উন্নতমানের খাবার গ্রহণ বা ধর্মীয় কারণে তাদের রোজা রাখার অনুমতি রয়েছে। আইনে কয়েদীদের নিয়মিত ধর্মগুরুর কাছে যেতে পারা বা নিয়মিত ধর্মীয় আচার প্রতিপালনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, তবে তাদের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষকে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীর দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তার বিশ্বাসের একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তার কাছে হাজির করতে হয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ফলে সরকার ব্যক্তি, বিশেষত হিন্দুদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার সক্ষমতা লাভ করে, যাদেরকে পূর্বে রাজ্যের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। অতীতে কর্তৃপক্ষ এই আইনটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী বিশেষত হিন্দুদের দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের জন্য ব্যবহার করেছিল। এই হিন্দুরা ১৯৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল।

দেশটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ।

সরকারি অনুশীলন

২৭ নভেম্বর বাংলাদেশের একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ২২ জন ব্যক্তি যাদের বেশিরভাগই অমুসলমান, তাদেরকে হত্যার ভূমিকায় দণ্ডিত সাতজন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। অষ্টম আসামীকে খালাস দেওয়া হয়েছিল। বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের আইনজীবীগণই বলেছেন যে তারা এই রায়গুলির বিরুদ্ধে আপিল করবেন, সরকারিপক্ষ কেবল একজনকে খালাস দেওয়ার বিরুদ্ধে আবেদন করবে। অসংখ্য প্রতিবেদন অনুসারে, হামলাকারীগণ, যারা আইএসআইএসের প্রতি আনুগত্যের দাবি করেছিল, তারা অমুসলিমদের চিহ্নিত করে এবং তলোয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুসারে, পুলিশি তদন্তে দেখা গেছে যে এই হামলায় ২২ জন জড়িত ছিল: আটজন যাদের বিচারকার্য শেষ হয়েছিল – এদের মধ্যে দুজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল; পাঁচজন নিহত হয়েছিল হলি আর্টিজান বেকারিতে আক্রমণের সময় নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিরোধে, এবং নয়জন বিভিন্ন সময়কালে মৃত্যুবরণ করে নিরাপত্তাবাহিনীর আক্রমণে।

২০১৫ সালে নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে আইনী কার্যক্রম বছরের শেষ অবধি অব্যাহত ছিল। মার্চ মাসে ঢাকার একটি আদালত হত্যা মামলাটি সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালে বিচারের কার্যক্রমের জন্য স্থানান্তর করে। হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ছয়জনের বিচার শুরু হয় এপ্রিল মাসে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক রায়কে কুপিয়ে হত্যা করে হামলাকারীরা। হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি ঢাকার একটি বইমেলা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তার স্ত্রীকে নিয়ে। তার স্ত্রীও হামলায় আহত হন। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে পুলিশ ভারতীয় উপমহাদেশের আল কায়েদার (একিউআইএস) সাথে সম্পৃক্ততা দাবিকারী একটি ইসলামি জঙ্গী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমকে সন্দেহ করেছিল। আনসারুল্লাহ বাংলা টিম অন্যান্য সহিংস ঘটনার সঙ্গেও জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করেছিল। আসামিদের মধ্যে চার জন গতবছর আদালতে হাজির হয়েছিলেন, অন্য দু'জন পলাতক।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হিন্দু ব্যক্তি, বাড়ি এবং মন্দিরে ২০১৬ সালের হামলার বিষয়ে পুলিশ আটটি তদন্তের মধ্যে থেকে একটি শেষ করে। ডিসেম্বর ২০১৭ সালে, ২২৮ জনের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি জামিনে মুক্ত ছিলেন। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হামলার পর তিন বছরে আটটি তদন্তের একটির সমাপ্তির পরে এই মামলায় আর কোনও অগ্রগতি হয়নি, এবং অন্য সাতটি তদন্ত শেষ করার জন্য বা অভিযুক্ত ২২৮ এর শুনানির সময়সূচী দেওয়ার জন্য কোন সময়সীমাও দেওয়া হয়নি। আদালত বছর শেষের আগে কোন শুনানিও করেননি। মক্কার কাবা শরিফের গায়ে হিন্দু দেবতার ছবি পেস্ট করে একজন হিন্দু

বাসিন্দার ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হামলাকারীরা ১০০ জনেরও বেশি লোককে আহত করে এবং ৫২টি হিন্দু বাড়ি এবং ১৫টি মন্দির ভাঙচুর করে। দেশটির জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে যে হামলাটি করা হয়েছিল ওই এলাকা থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাদের জমি দখলের উদ্দেশ্যে ।

সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, নভেম্বরে সরকার সাঁওতাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে, যারা ২০১৬ সালে একটি সহিংস হামলার শিকার হয়েছিলেন। এ হামলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীরা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাগুলি যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ না করলেও, এই মামলার কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই সদস্যদের আইনী ও প্রশাসনিক ফি প্রদান করতে হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে হামলায় নিহত এক ব্যক্তির ভাইও ছিলেন। একই সময়ে, এই হামলায় পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে হামলাকালীন ভিডিওচিত্রে দৃশ্যমান পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল করে কর্তৃপক্ষ। ২৮ জুলাই জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটি জানায় যে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে কোন পুলিশ অফিসার বাড়িঘর এবং স্কুল পুড়িয়ে দেওয়ার এবং সম্পত্তি লুট করার ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন না। জড়িত থাকার ভিজ্যুয়াল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে তা বলা হয়।

মানবাধিকার সংস্থাগুলি "নৈতিক সীমালঙ্ঘন" বিবেচনায় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নেতাদের এবং স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিচারবহির্ভূত ফতোয়া ব্যবহার করে ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার কোন ঘটনা রিপোর্ট করেননি, যা আগের বছরগুলির রিপোর্টের ব্যতিক্রম।

যদিও বেশিরভাগ মসজিদই রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র ছিল, তবে সরকার ইমামদের নিয়োগ ও অপসারণে ক্ষেত্রে প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। ইমামগণের খুতবার বিষয়বস্তুতেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাধ্যমে সারাদেশে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে । এর মধ্যে একটি উদাহরণ হল কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর হাদিস তুলে ধরে লিখিত নির্দেশনা জারি করা। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ বলেছেন মসজিদগুলোতে ইমামগণ সাধারণত সরকারি নীতিবিরোধী খুতবা চর্চা এড়িয়ে চলেন। এপ্রিলে সরকার মসজিদগুলিকে চরমপন্থার নিন্দা করবার নির্দেশ দেয়।

সরকার উগ্রপন্থী মতাদর্শের প্রচারের কথা উল্লেখ করে জাকির নায়েকের ভারত-ভিত্তিক ইসলামিক *পিস টিভি বাংলার* প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রেখেছে এবং "পিস স্কুল" বন্ধ করে দেয়, যেগুলোতে জাকির নায়েকের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটত বলে সরকার উল্লেখ করেছে ।

মে মাসে পুলিশ ক্যাথলিক কবি হেনরি স্বপনকে গ্রেপ্তার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "ক্যাথলিকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা" এবং যাজকদের সমালোচনা ও অবমাননা করার অভিযোগে । বরিশালের স্থানীয় প্রিস্ট ফাদার লরেন্স গোমেসের অভিযোগের পরেই তিনি গ্রেফতার হন। বরিশালে স্বপনেরও বাড়ি। গোমেসের মতে, সাওপন বলেছেন যে যুবক প্রিস্টগণ তরুণদের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন যেখানে মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছিল। বছর শেষে স্বপন কারাগারে রয়েছেন।

ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ ২০১৮ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে দায়ের করা ১১৮,১৭৩টি সম্পত্তি-পুনরুদ্ধারের মামলার মধ্যে ১৫,২২৪টির বিচার করেছে। এই রায়গুলির মধ্যে মালিকরা, মূলত হিন্দুগণ, ৭,৭৩৩টি মামলায় জিতে ৮,১৭৭.৫ একর জমি পুনরুদ্ধার করেছে, অন্যদিকে সরকার ৭,৯৯১টি ক্ষেত্রে জিতেছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, মানবাধিকার কর্মীগণ এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানন ঐক্য পরিষদ বলেছেন যে, হিন্দুদের ভূমি ফিরিয়ে দেয়ার এই ধীরগতীর জন্য বিচারিক অদক্ষতা এবং সাধারণ সরকারের উদাসীনতা দায়ী।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা মাঝেমধ্যে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষক না থাকায় তারা ক্লাসে অংশ নিতে পারে না। এইরকম ক্ষেত্রে স্কুল কর্মকর্তারা সাধারণত স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পিতামাতা বা অন্যদেরকে স্কুলের সময়ের বাইরে এই জাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাস করার অনুমতি দিয়ে থাকেন এবং কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেন।

সর্বসাম্প্রতিক প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (জুন ২০১৮-জুলাই ২০১৯) জন্য ১১.৬৮ বিলিয়ন টাকা ($১৩৭.৪ মিলিয়ন) বাজেট ছিল। বাজেটে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ধর্মীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা ৯.২১ বিলিয়ন টাকা ($১০৮.৪ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ৮.২৪ বিলিয়ন টাকা ($৯৬.৯ মিলিয়ন) বরাদ্দ দেয়। হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ৭৮০.৮ মিলিয়ন টাকা ($৯.২ মিলিয়ন) পেয়েছে এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৩৭.৫ মিলিয়ন টাকা ($৪৪১,০০০) পেয়েছে। খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট ২০৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট থেকে উন্নয়ন তহবিলে কোন বরাদ্দ পায়নি, তবে অফিস পরিচালানের জন্য এটি ২.৮ মিলিয়ন টাকা ($৩২,৯০০) পেয়েছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ যাদের কেউ কেউ জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীরও সদস্য বেশ কিছু সম্পত্তি ও ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ এবং সরকার ও অন্যদের দ্বারা জোরপূর্বক উচ্ছেদ সম্পর্কে রিপোর্ট অব্যাহত রাখেন, যেগুলো বছরের শেষেও সমাধান হয়নি। মৌলভীবাজার ও মধুপুর বনাঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমির উপর সরকার নির্মাণ প্রকল্প চালিয়ে যায়। জুলাইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি গ্রাম মিলে জেলা প্রশাসকের কাছে জসিম উদ্দিন মন্টু নামে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ এনে একটি প্রতিবেদন দায়ের করে। দ্য ডেইলি স্টারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে পার্বত্য এলাকায় পর্যটন স্থাপনা তৈরির উদ্দেশ্যে জমি কেনার অধিকার পেতে মন্টু বান্দরবানে ভুয়া রেসিডেন্সির দলিল তৈরি করেছেন। গ্রামবাসীরা জানান, বান্দরবানে একটি দ্বিতল পুলিশ ক্যাম্প তৈরির জন্য মন্টু অর্থ এবং ক্রয়কৃত কিছু জমি অনুদান হিসেবে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর মতে, নতুন রাস্তা বা শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলগুলির কাছে এমন জায়গাগুলিতে, যেখানে জমির দাম সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে, এই জাতীয় বিরোধগুলি দেখা দেয়। তারা আরো বলেছেন যে স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পত্তি দখলে সহায়তা করেন অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সম্পত্তি আত্মসাৎকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিছু মানবাধিকার গোষ্ঠী এসব বিরোধের অনেকগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিকূল সরকারি নীতির চেয়ে বরং বিচারিক ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর রাজনৈতিক এবং আর্থিক প্রতিপত্তির অভাবকে দায়ী করে চলেছে।

সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজনস্থল যেমনঃ হিন্দুদের উৎসব দুর্গাপূজা, খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস ও ইস্টার, বৌদ্ধদের উৎসব বৌদ্ধপূর্ণিমায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে।

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং খ্রিস্টানদের প্রতিটি প্রধান ছুটির দিন স্মরণে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রেখেছেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি

শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী একটি আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির সুরক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বাসের (ইসলাম) দায়িত্বের কথা বলেন এবং সবাইকে একটি সাধারণ ছাতার নীচে কাজ করার এবং অইক্যাবদ্ধভাবে সাধারণ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।

অধ্যায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থা

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা কক্সবাজারে একটি বৌদ্ধ পরিবারের চার সদস্যকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ১০ বছরের কম বয়সী দুটি শিশুও ছিল। পরিবারটি কক্সবাজারের একটি বৌদ্ধপ্রধান গ্রামে বাস করত এবং বছরের শেষ দিকে এসেও হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থেকে যায়।

সংবাদপত্রের একাধিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগস্ট পুলিশ ঢাকা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) দূরে কুমিল্লার একটি রেল ব্রিজের নিচে থেকে জ্ঞানরত্ন বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু অমৃত নন্দার লাশ উদ্ধার করে। সংবাদমাধ্যমের বর্ণনা অনুসারে, নন্দার গলা চেরা ছিল, এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যরা মনে করেন যে ঢাকা থেকে তার নিজ শহরে ফেরার সময় তাকে হত্যা করার পর তার মৃতদেহ ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ এবং মানবাধিকারকর্মীরা নন্দার মৃত্যুর পরে সারা দেশে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। তবে বছরের শেষেও, এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সংখ্যালঘু পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (বিএইচবিসিইউসি) বলেছে যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে "নৃশংসতা" অব্যাহত ছিল যদিও তা কমেছে । ভূমি দখল, ধর্ষণ, এবং অগ্নিসংযোগসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড "নিত্যনৈমিত্তিক" ঘটনার মতো রয়ে গেছে, তবে বিএইচবিসিইউসি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সরবরাহ করেনি বা উদাহরণ দেয়নি। ২০১৮ এর বিপরীতে তুলনা করলে দেখা যায়, সেবছর বিএইচবিসিইউসি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নিপীড়নের ৮০৬ মামলা নথিভুক্ত করেছে, কিন্তুসংগঠনটি প্রতিবেদন বছরে কোন পরিসংখ্যানিক তথ্য প্রকাশ করেনি।

খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অন্যান্য মানবাধিকার এনজিওগুলো ইসলাম ও হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানগণ হয়রানি, শারীরিক সহিংসতার সাম্প্রদায়িক হুমকি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে । এনজিওগুলো জানিয়েছে যে ব্যক্তিরা সাধারণত কোন ব্যক্তির বিশ্বাসকে তার উপাধির সাথে যুক্ত করে। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার রক্ষার জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও, খ্রিস্টান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মতে, কারো দাবি করা বিশ্বাস যখন তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সেই ব্যক্তির উপর হয়রানি, হুমকি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে, বিশেষত যদি দাবি করা বিশ্বাসটি খ্রিস্টিয় হয়।

অক্টোবরে ইসলামি পোশাক পরিহিত দাঙ্গাকারীগণ ইসলামি ব্যানার বহন করে ভোলায় দু'জন মুসলমানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন হিন্দু শিক্ষার্থীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে চাঁদাবাজির উদ্দেশ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য পোস্ট করার অভিযোগ ছিল। দাঙ্গাকারীরা হিন্দু ছাত্রটিকে গ্রেপ্তারের রাখার দাবি করেছিল, তারা একটি স্থানীয় হিন্দু মন্দিরে লুণ্ঠন করেছিল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের তাদের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে সঙঘর্ষে জড়ায় এবং দাবী করে যে আত্মরক্ষার্থে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করতে

হয়েছিল। ফলে চারজন নিহত হন। পুলিশ দাবী করে যে দাঙ্গাকারীদের হাতে শটগান ছিল। দাঙ্গায় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। হ্যাকিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত দু'জন মুসলমান গ্রেপ্তার হয়েছিল, এবং সেই হিন্দু শিক্ষার্থী যে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং ও তৎপরবর্তী চাঁদাবাজির চেষ্টা সম্পর্কে পুলিশকে জানিয়েছিল তাকেও আটক রাখা হয়।

বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নভেম্বরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা টাঙ্গাইলের একটি হিন্দু কালী মন্দিরে প্রবেশ করে পাঁচটি প্রতিমা ভাঙচুর করে। স্থানীয় এক হিন্দু নেতা বলেছেন, দোষীরা এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষতি করতে এই কাজ করেছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ বলেছে যে তারা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, অভিনেত্রী সাবা কবিরকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল তার এমন কিছু মন্তব্যের পর যেগুলো কিছু মানুষের মনে হয়েছিলো যে তিনি নাস্তিকতা স্বীকার করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে তীব্র সমালোচনার পরে তিনি অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করার জন্য তার ফেসবুক পেজে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে যে, ২০১৯ সালের প্রথম ১০ মাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় কমপক্ষে ১০১ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়াও গ্রুপটি বলেছে, কমপক্ষে ৬৫টি মন্দির/মঠ বা মূর্তি আক্রমণ করা হয়েছিল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৫৩টি বাড়িতে হামলা ও আগুন দেওয়া হয়েছিল। কিছু বৌদ্ধ এখনো আশঙ্কা করেন যে বার্মায় মুসলিম রোহিঙ্গাদের সাথে বৌদ্ধ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় (বাংলাদেশের) স্থানীয় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিহিংসামূলক আচরণ করবে।

বেসরকারী সংস্থাগুলি মুসলিম বাঙালি বসতি স্থাপনকারী এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যারা বৌদ্ধ, হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, জমির মালিকানা নিয়ে উত্তেজনা অব্যাহত থাকার বিষয়টি জানিয়েছে। আদিবাসী অমুসলিমদের প্রভাবিত করে এমন ভূমি মালিকানা বিরোধগুলো নিষ্পত্তির জন্য সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির আলোকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইনের সুসংহতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের ২০১৭ সালের সংশোধনী ব্যবহার করছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যের মতে, প্রক্রিয়াগত সমস্যাগুলি তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেকগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়াতে বিলম্ব ঘটায়।

অধ্যায় ৩: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি ও সংশ্লিষ্টতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার গুরুত্বের উপর জোর দিতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন। তারা ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিংস চরমপন্থার মধ্যকার সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা নীতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানানোর এবং চরমপন্থী হামলা থেকে এ ধরণের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূতের দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর ও বিবৃতিগুলো দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

দূতাবাস সফলভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছিল যেন জনৈক হিন্দু অধীকার কর্মীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ না আনে।

আগস্ট ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র বার্মা থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম জাতিগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের জন্য ৬৯৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মানবিক সহায়তা দিয়েছে। এর থেকে মোট ৫৩৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও তাদের আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের সহায়তায় ব্যয় হয়েছে।

কম্যুনিটি পুলিশিং প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দূতাবাস ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করেছে।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতাকে উৎসাহিত করতে পাবলিক আউটরিচ কর্মসূচিগুলি বছরজুড়ে অব্যাহত ছিল, যার মধ্যে একটি ২৫শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি ধর্মীয় উৎসবে অংশ নিয়েছেন এবং এগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। অক্টোবরে রাষ্ট্রদূত দেশের তিনটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানগুলোতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ধর্মীয় সহনশীলতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর জোর দিয়েছেন।

দূতাবাস ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা সমর্থনের লক্ষ্যে সারা বছর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারনা চালায়। জুলাই মাসে ওয়াশিংটন, ডিসিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় "মিনিস্টেরিয়াল টু অ্যাডভান্স রিলিজিয়াস ফ্রিডমে" যোগদিতে যাবার আগে (বাংলাদেশের) একদল ধর্মীয় ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রদূতের সাথে একটি সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন। দূতাবাস সেই বৈঠকের ছবি এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে। ২৩ আগস্ট "ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে" জাতিসংঘের প্রথম আন্তর্জাতিক দিবসটিকে স্বীকৃতি দিয়ে দূতাবাস এর ফেসবুক এবং টুইটার পেইজে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। অক্টোবরে দূতাবাস দু'টি ফেসবুক পোস্ট প্রকাশকরেছে, যেখানে লেখা ও ছবিসহ খ্রিস্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধদের তিনটি আলাদা ধর্মীয় উৎসবে রাষ্ট্রদূতের অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরা হয়েছিল।

দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেন এবং তাদের সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ওয়ার্ল্ড বৌদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, এবং আগা খান ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা এবং প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করেন। এসব বৈঠকে দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুগণ যেসব চ্যালেঞ্জের হয়েছেন সেগুলো চিহ্নিত করা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ ব্যাপক পরিসরে মানবাধিকার উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ১১টি বিদেশী মিশনের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে নিয়মিত বৈঠক করেন।